বৈজ্ঞানিক অপব্যাখ্যা ও খন্ডন

ইমতিয়াজ আহমেদ

বিজ্ঞান ব্লগ মুক্তবই

বৈজ্ঞানিক অপব্যাখ্যা ও খন্ডন

মুক্ত ই-বই

প্রথম প্রকাশ আগস্ট ২০১৬

স্বত্ব: লেখক

প্রচ্ছদ ছবি

নিকো ক্রিসাফুলি

প্রচ্ছদ

আরাফাত ও এহতেশামুল

প্রকাশক

বিজ্ঞান ব্লগ মুক্তবই

https:// bigganblog.org

উৎসর্গ

ফয়েজ আহমেদ ও রওশন আরা বেগম

যথাক্রমে আমার পিতা ও মাতা'র করকমলে

মুখবন্ধ

বিজ্ঞান আমাদের আধুনিক জীবন-যাপনের প্রায় পুরোটাই নিয়ন্ত্রণ করছে। বর্তমান যুগে বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়ে ন্যুনতম জানাশোনা না থাকলে জীবন-ধারণ করা কঠিন। তবে বিজ্ঞানের অগ্রগতির সাথে সাথে এক শ্রেনীর অসাধু ব্যক্তিকে দেখা যায় বিজ্ঞানের মোড়কে নানাবিধ অপবৈজ্ঞানিক বা অবৈজ্ঞানিক বিষয়বস্তু হাজির করতে। তাছাড়া অনেকসময় মানুষের অজান্তেই নানাবিধ ভুলভাল বিষয় ছড়িয়ে পড়ে এবং মানুষের মনে এমনভাবে গেঁথে যায় যে সেগুলো হতে পরিত্রাণ পাওয়া দুঃষ্কর হয়ে দাঁড়ায়। এছাড়া মানুষ ফ্যান্টাসি পছন্দ করে। চমকজাগানিয়া বিষয়গুলো তাকে যতটা আকর্ষন করে বিজ্ঞানের কাট-খোট্টা বিষয়গুলো অনেকসময় সেভাবে আকর্ষণ করতে পারে না, এভাবেও বিভিন্ন অপব্যাখ্যা ছড়িয়ে থাকে। এর বাইরেও একসময় হয়তো বৈজ্ঞানিকভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে কিন্তু পরবর্তীতে বিজ্ঞানের অগ্রগতির সাথে সাথে বাতিল হয়ে গেছে এমন বিষয়ও রয়েছে ভুরিভুরি। এমনকি অনেক-সময় বিজ্ঞানীদের খামখেয়ালিপনা এবং ঠাট্টাচ্ছলে করা মন্তব্যের মাধ্যমেও অনেক অবৈজ্ঞানিক বিষয় প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। এই বইটিতে মূলতঃ দীর্ঘদিন থেকে প্রচলিত হয়ে আসা বৈজ্ঞানিক অপব্যাখ্যাগুলো খন্ডন করে প্রকৃত বিষয়গুলো তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। বইটিতে সম্পাদনা করে প্রকাশের উদ্যোগ নেওয়ায় আমি আরাফাত রহমানের কাছে বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ।

ইমতিয়াজ আহমেদ

১১ জুলাই, ২০১৬

সূচী

১. গড়পড়তা মানুষ মস্তিষ্কের ৫ থেকে ১০% ব্যবহার করে

২. বিশেষ উপযোগী পোশাক ছাড়া মহাশুন্যে গেলে মানুষ ফুলে ফেটে যায়

৩. বিবর্তনের মাধ্যমে জীবের উন্নতি ঘটে

৪. স্নায়ুকোষের (neuron) পুনরুৎপাদন হয় না, যদি কোনো স্নায়ুকোষ ধ্বংস হয় তাহলে তার আর প্রতিস্থাপন হবে না

৫. বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে মস্তিষ্কের কর্মক্ষমতা হ্রাস পায়

৬. উল্কাপিন্ড পতনের সময় বায়ুমন্ডলের সাথে সংঘর্ষে উত্তপ্ত হয়ে যায়

৭. মহাশূন্যে অভিকর্ষ অনুভুত হয় না

৮. মাথায় আপেল পড়ার ঘটনা থেকে নিউটন মহাকর্ষ সূত্র আবিষ্কার করেন

৯. চীনের প্রাচীর একমাত্র মানবসৃষ্ট বস্তু যেটা চাঁদ থেকেও দেখা যায়

১০. বাদুড়ের চোখ আছে কিন্তু চোখে দেখে না

১১. মার্কনি রেডিও উদ্ভাবন করেছেন / জগদীশ বসু রেডিও উদ্ভাবন করেছেন

১২. জিহ্বার একেক অংশ একেক ধরনের স্বাদের অনুভূতি তৈরি করে

১৩. না খেয়ে থাকলে আমাদের ওজন কমে

১৪. আইনস্টাইন স্কুল জীবনে গণিতে ফেল করতেন

১৫. একস্থানে দুইবার বজ্রপাত হয় না

১৬. হিগস বোসন আবিষ্কারের পিছনে সত্যেন্দ্রনাথ বসুর অবদানকে যথাযথ মূল্যায়ন করা হয় নি

১৭. কলম্বাস আমেরিকা আবিষ্কার করেছেন

১৮. গোল্ডফিসের স্মৃতি মাত্র দুই/তিন সেকেন্ড

১৯. সাধারণ তাপমাত্রাতেও কাচ প্রবাহিত হয়

২০. মানুষের উৎপত্তি হয়েছে বানর থেকে

২১. উটপাখি বিপদ দেখলে বালিতে মাথা গুঁজে ফেলে

২২. জেমস ওয়াট বাষ্পীয় ইঞ্জিন উদ্ভাবন করেন

২৩. ঠান্ডা লাগলে ভিটামিন সি নিরাময় করতে পারে

২৪. মানুষের পাঁচ ধরনের ইন্দ্রিয় বা অনুভূতি আছে

২৫. বিবর্তন তত্ত্ব প্রাণের উদ্ভব ব্যাখ্যা করে

২৬. চাঁদে মানুষ যাওয়া নিয়ে নির্মিত ষড়যন্ত্রতত্ত্বগুলোর জবাবে

আমাদের চারপাশে ছড়িয়ে আছে হাজার রকমের মিথ (myth) এবং এগুলোর একটি বিশাল অংশ বৈজ্ঞানিক তথ্য সম্বলিত। এগুলোর কিছু কিছু এতোটাই প্রচালিত যে এমনকি বৈজ্ঞানিক কমিউনিটিতেও সেগুলো ছড়িয়ে আছে সমান ভাবে। সেই মিথগুলোর যুক্তিখন্ডন এবং ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের জন্যই এই ধারাবাহিকটির অবতারণা করা হয়েছে। এখানে ক্রমান্বয়ে বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক মিথ বা অপব্যাখ্যার প্রকৃত বাস্তবতা তুলে ধরার প্রয়াস থাকবে।

১

গড়পড়তা মানুষ মস্তিষ্কের ৫ থেকে ১০% ব্যবহার করে

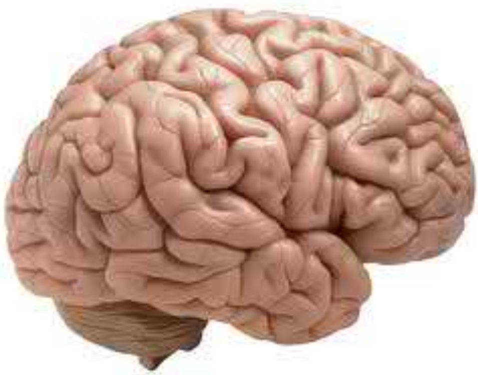

মানুষ সম্পূর্ণ মস্তিষ্কই ব্যবহার করে। মস্তিষ্কের যেকোন প্রক্রিয়া আসলে মস্তিষ্কের বিভিন্ন অংশের একযোগে ক্রিয়াকান্ডের ফসল। ১০% মিথের উৎপত্তি হয় বিংশ শতাব্দীর শুরুতে। ১৯০৮ সালে উইলিয়াম জোন্স লিখেন "আমরা আমাদের সম্ভাব্য মানসিক ও শারীরিক সক্ষমতার একটা ক্ষুদ্র অংশ ব্যবহার করি"। ১৯২০ থেকে ১৯৩০ সালে সংগঠিত কিছু পরীক্ষা-নিরীক্ষা হতে এই মিথ সবচেয়ে বেশী প্রচলিত হয়। কার্ল ল্যাসলে ইঁদুরের মস্তিষ্কের সেরিব্রাল কর্টেক্সের বিশাল একটা অংশ সরিয়ে ফেলার পরও দেখা গেলো ইঁদুরের কর্মকান্ড স্বাভাবিক ভাবেই চলছে। সেই থেকে ১০% ব্যবহারের ধারনা চালু হয়ে গেছে। কিন্তু এই পরীক্ষায় যা অনুপস্থিত ছিলো সেটি হচ্ছে ইঁদুরের আচরণ অনুধাবণ করার ক্ষমতা। আমরা যদি একই পরীক্ষা মানুষের জন্য

করি তাহলে দেখা যাবে, পরীক্ষাকৃত মানুষের স্বাভাবিক অভ্যাসজনিত আচার-আচরণ, স্মৃতিশক্তি, চিন্তাশক্তি এইসব আমূল পরিবর্তিত হয়ে গেছে, যেটা ইঁদুরের ক্ষেত্রে পর্যবেক্ষণ সম্ভব ছিলো না। বর্তমানে আধুনিক ইমেজিং এবং ম্যাপিং প্রযুক্তির বদৌলতে গবেষকগণ বুঝতে পারছেন মানুষ মস্তিষ্কের সম্পূর্ণ অংশই ব্যবহার করে।

২

বিশেষ উপযোগী পোশাক ছাড়া মহাশুন্যে গেলে মানুষ ফুলে ফেটে যায়

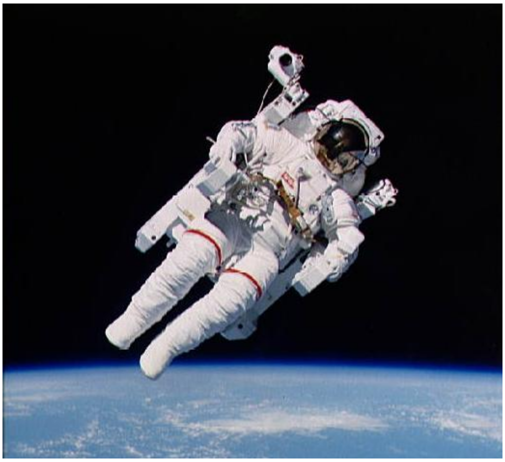

এই মিথ সম্ভবত চালু হয়েছে বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক কল্পকাহিনী এবং হলিউডের মুভি থেকে। এটি সত্য মানুষ যেই বায়ুমন্ডলে বাস করে তা মানুষের প্রতিবর্গমিটার পৃষ্ঠে প্রায় ১০ টনের মত চাপ দিচ্ছে (প্রতি বর্গইঞ্চিতে সাড়ে সাত কেজি)। কিন্তু এই পরিমান চাপ এতো বেশি নয় যে মহাশুন্যের চাপহীন অঞ্চলে গেলে শরীর ফুলতে থাকবে এবং এক পর্যায়ে ফেটে যাবে। প্রকৃতপক্ষে জীবের টিস্যুকে এইভাবে চাপ প্রয়োগ বা হ্রাস করে সংকুচিত বা প্রসারিত করাও যায় না। বরং মানুষ যদি মহাশূন্যে যায় তাহলে যা ঘটে তাহলো নিম্মচাপে দেহাভ্যন্তরস্থঃ পানি খুব সহজে বাস্পীভুত হয়ে যায় (আমরা

ছোটোবেলায় পড়েছিলাম সুউচ্চ পর্বতে রান্না করা দুরুহ পানি দ্রুত বাস্পীভূত হয়ে যায় বলে!)। ভুপৃষ্ঠে বায়ুমন্ডলের গড় চাপ ৭৬০ মিমি পারদ চাপ। যখন বাহ্যিক চাপ ৪৭ মিলিমিটার পারদ চাপের নিচে নেমে যায় অর্থাৎ স্বাভাবিক বায়ুমন্ডলীয় চাপের ২০ ভাগের ১ ভাগ হয় তখন এই জলীয় বাস্প চামড়া ভেদ করে বাইরে চলে আসে এবং বাস্পীভবনের জন্য প্রয়োজনীয় বিপুল পরিমান সুপ্ততাপ শরীর থেকে গ্রহণ করে বের করে দেয় যার ফলে তাপমাত্রার আকস্মিক অবনমণ ঘটে এবং মানুষ মারা যায়।

৩

বিবর্তনের মাধ্যমে জীবের উন্নতি ঘটে

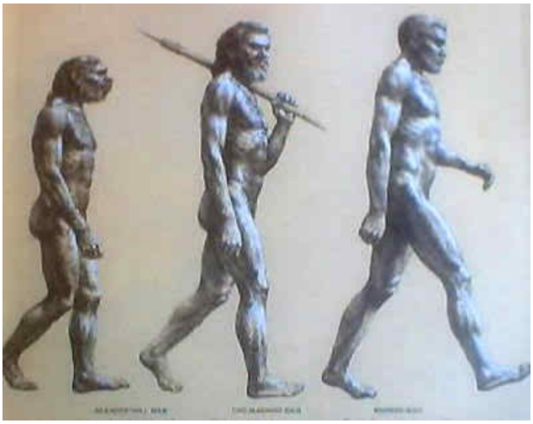

বিবর্তন আসলে সম্পূর্ণ বিক্ষিপ্ত একটি প্রক্রিয়া। তাই এক প্রজন্ম থেকে পরের প্রজন্মে জীবের বৈশিষ্ট্যের পরিবর্তন ঘটে। সেটা উন্নতি বা অবণতি কিংবা নিরপেক্ষও হতে পারে। সেই পরিবর্তনকে আমরা উন্নত বলতে পারি কেবল তখনই যখন তা তার পরিবেশের সাপেক্ষে তাকে কিছুটা অতিরিক্ত সুবিধা দেয়। এবং কোনো একটা বিশেষ সময়ে কোনো বৈশিষ্ট্যকে যদি উন্নত মনে করা হয়, পরবর্তীতে পরিবর্তিত পরিবেশ ও পরিস্থিতিতে সেটিই হয়তো ক্ষতিকর বৈশিষ্ট হিসেবে বিবেচিত হয়। ডাইনোসর যেই ঘটনায় বিলুপ্ত হয়েছিলো সেই ঘটনা কিন্তু সেই সময় ইঁদুর জাতীয় প্রাণীগুলোকে ধ্বংস করতে পারে নি। একই কারনে বলা যায় মানুষের সাথে অন্য প্রাইমেটদের খুব বেশী পার্থক্য নেই। কিছু কিছু প্রাইমেটের এমন কিছু ক্ষমতা আছে যা

মানুষের নেই এবং vice versa। যেমন, শিম্পাঞ্জী মিলিসেকেন্ডের জন্য দেখা কোনো ঘটনা হুবহু মনে রাখতে পারে। যেই ছোট দু'একটি ক্ষমতার কারনে মানুষ এখন প্রকৃতিকে শাসন করছে তা হলো মানুষ এক প্রজন্ম থেকে পরের প্রজন্মে অভিজ্ঞতা স্থানান্তর করতে পারে এবং মানুষ তার চারটি আঙ্গুলকে বৃদ্ধাঙ্গুলের বিপরীতে বাঁকাতে পারে যার ফলে হাতিয়ার ব্যবহার সহজ হয়। এভাবে অভিজ্ঞতা স্থানান্তর করতে করতেই মানুষ এখন একটি জ্ঞানী প্রজাতি। কিন্তু মানুষকে যদি জন্মলগ্ন থেকে বন্য পরিবেশে ছেড়ে দেওয়া যায় তাহলে তার সাথে অন্য প্রাইমেটদের খুব বেশী পার্থক্য থাকে না।

৪

স্নায়ুকোষের পুনরুৎপাদন হয় না, যদি কোনো স্নায়ুকোষ ধ্বংস হয় তাহলে তার আর প্রতিস্থাপন হবে না

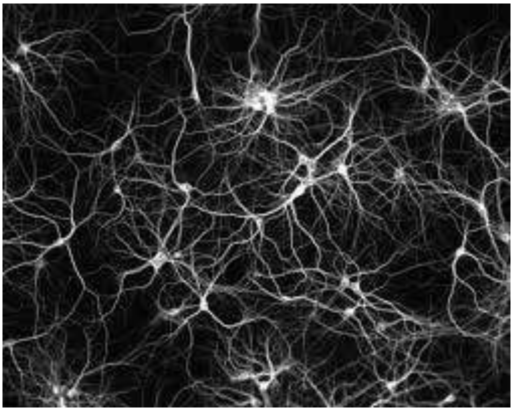

নব্বইয়ের দশকের একটি গবেষণা হতে প্রমাণ হয়েছে মানুষের মস্তিষ্ক স্টেমসেল ধারন করে। স্টেমসেল হচ্ছে সেই ধরনের কোষ যেগুলো প্রয়োজনের সময় যেকোনো কোষে পরিণত হতে পারে। যখন আঘাতজনিত বা অন্যকোনো কারনে মস্তিষ্কের কোনো কোষ কার্যকারিতা হারায় তখন এই স্টেমসেলগুলো স্নায়ুকোষে পরিণত হয়ে ক্ষয় পূরণ করে। পিপড়া যেখাবে সারিবদ্ধভাবে এগোয় নতুন স্নায়কোষগুলো এভাবই স্থানান্তরিত হয়ে নির্দষ্ট যায়গায় পৌঁছে যায় এবং পুর্বতন কোষগুলোর সাথে এক্সন ও ডেনড্রাইটের মাধ্যমে সংযোগ তৈরি করে। এই কারনে মস্তিষ্কে নিজের ক্ষতি মেরামত করতে পারে। প্রতিনিয়ত মস্তিষ্কের বিভিন্ন জায়গায় নিউরোজেনেসিসের মাধ্যমে নতুন নতুন নিউরণ তৈরি হচ্ছে এবং নিউরণসমূহের মধ্যে নতুন

নতুন সংযোগ তৈরি হচ্ছে।

৫

বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে মস্তিষ্কের কর্মক্ষমতা হ্রাস পায়

এটিও একটি ভুল তথ্য। আগের পয়েন্টে যা বলেছিলাম, প্রতিনিয়ত নিউরণসমূহের মধ্যে নতুন নতুন সংযোগ তৈরি হচ্ছে। এই কারনে বৃদ্ধবয়সে মানুষের মস্তিষ্কের ক্ষমতা আরো বৃদ্ধি পায়। বৃদ্ধ বয়সে অসহিষ্ণুতা বৃদ্ধিরও এটা একটা কারন। বৃদ্ধ বয়সে মানুষ পরিবেশ থেকে আরো বেশী তথ্য গ্রহণ করতে পারে যার কারনে খুব সহজেই আমরা পারিপার্শিক ঘটনার দ্বারা বিরক্ত বোধ করতে পারি। যেমন উচ্চ ভলিউমে গান বাজা, গোলমাল পর্যবেক্ষণ করা এসব তখন চাইলেও উপেক্ষা করে থাকা যায় না। তবে মাঝে মাঝে যেমন দেখা যায় বৃদ্ধ বয়সে স্মৃতি বিলোপ ঘটছে, কিংবা চিন্তাশক্তি হ্রাস পাচ্ছে বা মানুষ অপ্রকৃতিস্থ আচরণ করছে সেগুলো আসলে বিশেষ বিশেষ রোগের কারনে ঘটে থাকে যেগুলোর একটা বড়ো অংশ বংশগত। আর তাছাড়া শারিরীক অক্ষমতার সাথে অনেক সময় চিন্তাগত ক্ষমতা ঠিক খাপখায়না বলে কিছু অস্বাভাবিক প্রবণতা লক্ষ করা যায়।

অর্থাৎ বাস্তবতা হলো বৃদ্ধ বয়সে শারীরিক অক্ষমতার বিপরীতে মস্তিষ্কের

চিন্তাশক্তি এবং বিশ্লেষণ শক্তি বৃদ্ধি পায়। মানুষের বয়স যতোই বাড়তে থাকে ততোই তার মস্তিষ্কে নতুন নতুন নিউরন এবং সেগুলোতে নতুন নতুন সংযোগ তৈরি হয়। এছাড়া বয়স বাড়ার সাথে সাথে মানুষের অভিজ্ঞতা বাড়তে থাকে। সবকিছুর সমন্বয়ের মাধ্যমে বয়স্ক মানুষ অন্যদের চেয়ে সঠিকভাবে সিদ্ধান্ত নিতে সক্ষম।

৬

উল্কাপিন্ড পতনের সময় বায়ুমন্ডলের সাথে সংঘর্ষে উত্তপ্ত হয়ে যায়

ভুল! উল্কাপিন্ডের তাপমাত্রার উপর বাতাসের সংঘর্ষের প্রভাব খুব সমান্যই। উল্কাপিন্ড যখন বাতাসের মধ্য দিয়ে যায় তখন তার গতিবেগ থাকে ঘন্টায় কয়েকহাজার কিলোমিটার। উল্কাপিন্ড যখন দ্রুতবেগে এগিয়ে যায় তখন তার সামনের বাতাসে প্রচন্ড চাপ সৃষ্টি হয় (ram pressure)। আর গ্যাসীয় বস্তুকে চাপদিয়ে সংকুচিত করার চেষ্টা করলে তার তাপমাত্রা বেড়ে যায়। এবং তাতে কেবল উল্কার পৃষ্ঠদেশ উত্তপ্ত হয়। তাছাড়া যে আলো দেখা যায় সেটা তাপমাত্রা বৃদ্ধির কারনে তৈরি হয় না। বরং বাতাসের অনুর সাথে সংঘর্ষে কলিশন এনার্জী (collision energy) বা সংঘর্ষ শক্তি তৈরি হয় যার ফলে উল্কার পৃষ্ঠের ইলেক্ট্রনগুলো উত্তেজিত হয়ে উচ্চশক্তিস্তরে গমনকরে এবং পরে ফোটন নিঃসরণের মাধ্যমে নিম্ন শক্তিস্তরে ফিরে আসে। একই ভাবে ধারনা করা হয় পৃথিবীকে আঘাত করার ফলে উল্কাপিন্ড উত্তপ্ত অবস্থায় থাকে। কিন্তু উল্কাপিন্ড যদি বায়ুমন্ডল পেরিয়ে ভূ-পৃষ্ঠ পর্যন্ত পৌঁছাতে পারে তাহলে দেখা যায় সেগুলো হিমশীতল। এর কারন মাহাবিশ্বের ফাঁকা স্থানে তাপমাত্রা থাকে

পরমশূন্য তাপমাত্রার কাছাকাছি। ফলে এই উল্কাবস্তুগুলোরও তাপমাত্রা থাকে খুব কম। বাতাসের চাপের ফলে বেড়ে যাওয়া তাপমাত্রায় এদের বাইরের আস্তরণ পুড়ে যেতে পারে কিন্তু ভিতরটা তখনো যথেষ্ট ঠান্ডাই থাকে।

৭

মহাশূন্যে অভিকর্ষ অনুভুত হয় না

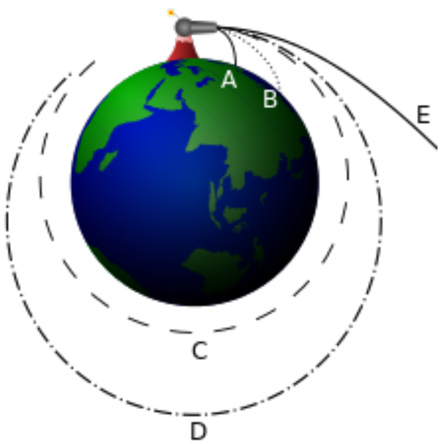

নভোচারীদের আমরা মহাশূন্যে ভেসে বেড়াতে দেখি। এতে ধারনা হয় যে মহাশূন্যে পৃথিবীর অভিকর্ষ অনুভুত হয় না। আসলে তা নয়। বরং নভোচারীরা যে উচ্চতায় প্রদক্ষিণ করেন সেখানেও তাঁদের ভূ-পৃষ্ঠের ওজনের প্রায় ৯০% ওজন ক্রিয়ারত থাকে। নভোচারীরা যখন ভূ-পৃষ্ঠ ছেড়ে উপরে উঠে যান তখন তাঁরা পৃথিবীকে দ্রুত গতিতে প্রদক্ষিন করতে থাকেন। এই প্রদক্ষিণরত অবস্থাকে আসলে মুক্তভাবে পড়ন্ত বস্তুর সাথে তুলনা করা যায়। মুক্তভাবে পড়ন্ত বস্তু ওজন অনুভব করে না। নভোচারী যখন পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করেন তখন কিন্তু তিনি আসলে মুক্তভাবে পড়ছেন। কিন্তু উচ্চগতির কারনে এবং অভিকর্ষের সাথে লম্ববরাবর একটা গতি থাকার কারনে তিনি যখন কিছুটা পড়তে থাকেন একই সময়ে সম্মুখগতি ততটাই তাঁকে পৃথিবী থেকে দুরে সরিয়ে রাখে, একারনেই তিনি মহাকাশে ভেসে বেড়ান। পাশের

ছবিটি দেখলে এই বিষয়ে ধারনা পরিষ্কার হবে। নভোযানের ভিতরে যেসব নভোচারী থাকেন তাঁরাও একই অভিজ্ঞতা লাভ করেন।

৮

মাথায় আপেল পড়ার ঘটনা থেকে নিউটন মহাকর্ষ সূত্র আবিষ্কার করেন

নিউটনের মাথায় আপেল পড়ার ঘটনা থেকে তিনি মহাকর্ষসূত্র আবিষ্কার করেন নি। এবং তাঁর সকল নোটপত্র ঘেঁটেও কখনো কোনো আপেলের বর্ণনা পাওয়া যায় নি। বরং তিনি দীর্ঘদিন থেকে মহাকর্ষ নিয়ে ভেবেছেন, ভেবেছেন কেন কোনো বস্তুকে ছেড়ে দিলে সেটা নিচের দিকেই নামে, উপরের দিকে উঠে যায় না। কোনো বস্তুকে শুন্যে ছেড়ে দিলে সেটা যে মাটিতে এসে পড়ে সেটা প্রত্যেক মানুষই পর্যবেক্ষণ করেন। সৃষ্টির আদিকাল থেকেই মানুষ দেখে আসছে কোনো বস্তুকে ছেড়ে দিলে সেটা নিচে পড়ে যায়। নিউটনের মাথায় যদি আপেল পড়েও থাকে তাহলেও সেটা নিশ্চয়ই তাঁর জন্য নতুন ঘটনা ছিলো না। এর আগেও তিনি বিভিন্ন বস্তুকে নিচে পড়তে দেখেছেন। নিউটন এতটা নির্বুদ্ধি ছিলেন না যে একদিন হঠাৎ একটি আপেল পড়ায় তাঁর মনের হলো আপেল নিচে নামল কেন? আপেল উপরে উঠে গেল না কেন? প্রকৃত

যে ঘটনাটি ঘটেছিলো বলে সবচেয়ে বেশী গ্রহণযোগ্য তা হচ্ছে তিনি কোনো এক আলোচনায় মহাকর্ষসূত্রটি বোঝাছিলেন। সেই আলোচনার এক পর্যায়ে তিনি আপেল গাছ থেকে আপেল পড়ার উদাহরণ টেনে আনেন। তিনি ব্যখ্যা করেন এভাবে *“আমি মাঝে মাঝে ভাবতাম কেন আপেল গাছ থেকে আপেল মাটিতে পড়ে ....”*। এই শেষোক্ত ঘটনাটির বর্ণনা পাওয়া যায় তাঁর এক বন্ধুর লেখা নোট থেকে।

৯
চীনের প্রাচীর একমাত্র মানবসৃষ্ট বস্তু যেটা চাঁদ থেকেও দেখা যায়

মানবসৃষ্ট কোনো বস্তুই চাঁদ থেকে দেখতে পাওয়া সম্ভব নয়। দৈর্ঘ্য যা-ই হোক না কেন একটা নির্দিষ্ট পরিমান প্রস্থ না থাকলে সেই জিনিসকে আলাদাভাবে শনাক্ত করা যাবে না। যেমন: চুল। আমরা যদি একটি লম্বা চুল নিয়ে সেটাকে দূর থেকে দেখার চেষ্টা করি তাহলে চুলের দৈর্ঘ্য যথেষ্ট বেশী থাকা সত্ত্বেও সেটা সরু হওয়ায় আমরা দেখতে পাব না। হিসেব করে দেখা যায় চাঁদ থেকে যদি পৃথিবীর কোনো বস্তুকে দৃষ্টিগোচরে আনতে হয় তাহলে তার মাত্রা হতে হবে অন্তত ৭০ মাইল বা ১১০ কিলোমিটার। দৈর্ঘ্য এবং

প্রস্থের যেকোনো একটিতে যদি এর চেয়ে পরিমান কম হয় তাহলে সেই বস্তুটিকে চাঁদ থেকে সনাক্ত করা যাবে না। চীনের প্রাচীর যদিও দৈর্ঘ্যে যথেষ্ট লম্বা কিন্তু এটি প্রস্থে মাত্র ৩০ ফুট। সেই হিসেবে চীনের প্রাচীরের চেয়ে আরো অনেক বেশী যোগ্যতা সম্পন্ন মানবসৃষ্ট বস্তু আছে যেগুলো ৩০ ফুটের চেয়ে অনেক অনেক বেশী চওড়া। ৭০ মাইল চওড়া হতে হলে ১২০০০ টিরও বেশী চীনের প্রাচীরকে পাশাপাশি যুক্ত করতে হবে।

১০
বাদুড়ের চোখ আছে কিন্তু চোখে দেখে না

বাদুড়ের চোখ আছে এবং সে চোখে দেখতে পায়। তবে বেশ কিছু প্রজাতির দৃষ্টিশক্তি ক্ষীণ।এছাড়া কিছু কিছু প্রজাতি অতিবেগুনী রশ্মিও সনাক্ত করতে পারে। এরা কাছাকাছি দুরত্বে অপেক্ষাকৃত সঠিক নির্দেশনা পাওয়ার জন্য শব্দযোগাযোগ (echolocation) ব্যবহার করে থাকে। কিন্তু দুরবর্তী বস্তু সম্বন্ধে নির্দেশনা পাওয়ার জন্য চোখই ব্যবহার করে। তাছাড়া কিছু কিছু প্রজাতি শব্দযোগাযোগ ব্যবহারই করে না এবং কিছু কিছু প্রজাতি অন্ধকারেও বেশ ভালো দেখতে পায়।

১১
মার্কনি / জগদীশ বসু রেডিও উদ্ভাবন করেছেন

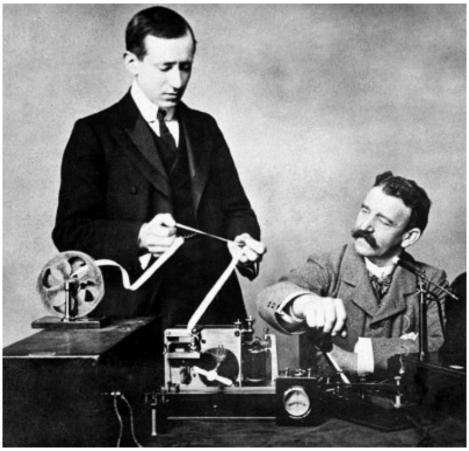

মার্কনি রেডিও উদ্ভাবন করেনি এবং ইতিহাসে তাঁকে রেডিওর উদ্ভাবক হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়াও হয় নি। প্রকৃতপক্ষে রেডিও কোনো ব্যক্তি এককভাবে উদ্ভাবন করেন নি। মার্কনির নাম এমন কি রেডিও উদ্ভাবকদের তালিকাতেও নেই। রেডিও আবিষ্কার নিয়ে জগদীশ চন্দ্র বসুকে জড়িয়ে বাঙ্গালির হা-পিত্যেসও যুক্তিযুক্ত নয়। রেডিও উদ্ভাবনের পিছনে এক ডজনেরও বেশী গবেষকের অবদান রয়েছে। এই গবেষকদের তালিকায় জগদীশ বসুর নামও ইতিহাসে লেখা আছে। তবে তিনি কখনো তাঁর কাজের প্যাটেন্ট করতে উৎসাহী ছিলেন না। কাজেই মার্কনি জগদীশ বসুর রেডিওর উদ্ভাবন নিজের নামে চালিয়ে বিখ্যাত হয়েছেন কথাটা আসলে মোটেও ঠিক নয়। বরং যদি কেউ সত্যিই বঞ্চিত হয়ে থাকেন তিনি হচ্ছেন অলিভার লজ।

রেডিওর উদ্ভাবকদের তালিকায় শেষের দিকেই তাঁর নাম। তিনি রেডিওকে যোগাযোগ মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করার প্রযুক্তি তৈরি করে ফেলেছিলেন। কিন্তু তাঁর উদ্ভাবন তিনি কাজে লাগিয়ে যেতে পারেন নি। মার্কনি মূলত রেডিওর বাণিজ্যীকিকরণ করেছিলেন এবং সাধারণ মানুষের হাতে রেডিও পৌঁছে দিয়েছিলেন। তিনি প্রথমবারের মতো রেডিওতে সম্প্রচার শুরু করেছিলেন। রেডিও উদ্ভাবনের পিছনে অবদান রাখা বিজ্ঞানীদের তালিকা পাবেন এই উইকিপিডিয়া আর্টিকেলে ।

১২
জিহ্বার একেক অংশ একেক ধরনের স্বাদের অনুভূতি তৈরি করে

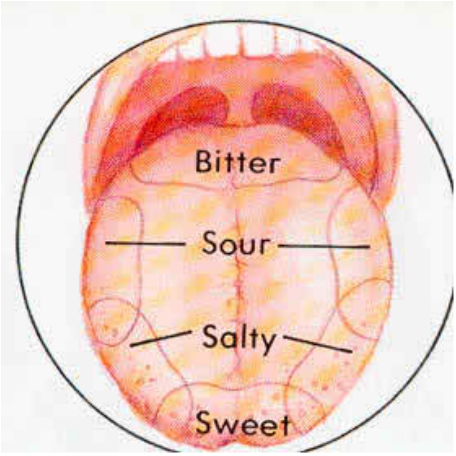

একসময় এই ধরনের তত্ত্ব দেওয়া হয়েছিলো যে, জিহ্বার বিভিন্ন অংশে বিভিন্ন ধরনের taste bud বা স্বাদ গ্রন্থি থাকে। যেমন: জিহ্বার অগ্রভাগে মিষ্টি, শেষভাগে টক এবং দুই পাশে যথাক্রমে নোনতা ও তিক্ততা স্বাদের গ্রন্থি থাকে (চিত্র অনুযায়ী)। প্রকৃত সত্যি হচ্ছে, জিহ্বার প্রতিটি অংশেই সবধরনের স্বাদগ্রন্থি মিশ্রিত অবস্থায় থাকে। এবং মানুষ জিহ্বার সব অংশেই সবরকম স্বাদ নিতে পারে। তবে স্বাদগ্রন্থির ঘনত্ব জিহ্বার কোনো অংশের চেয়ে কোনো অংশে কম বেশী হতে পারে এবং একই স্বাদগ্রন্থিও জিহ্বার বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন পরিমানে থাকতে পারে এবং সেই কারনে স্বাদেরও তারতম্য ঘটতে পারে তবে তার জন্য নির্দিষ্ট কোনো নিয়ম নেই, বিভিন্ন মানুষের মধ্যে বিভিন্ন ভাবে স্বাদগ্রন্থির পার্থক্য তৈরি হতে পারে। এই বিভ্রান্তি তৈরি হয়েছিলো

১৯০১ সালে যখন একটি জার্মান গবেষণাপত্রকে ইংরেজিতে ভুলভাবে অনুদিত করা হয়। মূল আর্টিকেলটি সহজবোধ্য ছিলো না এবং বিভিন্ন তথ্যও অস্পষ্ট ছিলো। মূল ছবিতে জিহ্বার যেই ম্যাপ দেখানো হয়েছিলো তাতে স্বাদের পার্থক্য বোঝানো হয় নি বরং স্বাদ সৃষ্টির জন্য ন্যুনতম পরিমানের ম্যাপ দেখানো হয়েছিলো।

১৩

না খেয়ে থাকলে আমাদের ওজন কমে

কথাটা আংশিক সত্য কিংবা স্বল্প মেয়াদের জন্য সত্য। দীর্ঘ মেয়াদে এটি ওজন বৃদ্ধির জন্য দায়ী হতে পারে। আমরা যদি না খেয়ে থাকি কিংবা প্রয়োজনের চেয়ে কম ক্যালরি গ্রহণ করি তাহলে শরীর ক্যালরি যোগানোর জন্য শুধু চর্বিই ক্ষয় করে না বরং মাংসপেশী তথা প্রোটিনেরও ক্ষয় হতে থাকে। আর আমাদের ক্যালরির চাহিদা আসে মূলত শরীরের বিভিন্ন মেটাবলিক কর্মকান্ড থেকে। শরীর গঠিত হয় প্রোটিন দিয়ে। যদি প্রোটিন কমে যায় তাহলে মেটাবলিক কর্মকান্ড জনিত ক্যালরির চাহিদাও কমে যায়। ফলে আমরা এসময় ক্যালরি যদি তুলনামূলকভাবে কমও গ্রহণ করি সেটা প্রয়োজনের তুলনায় বেশী হতে পারে। যা পরে চর্বি হিসেবে শরীরে জমে যেতে পারে। সঠিকভাবে ওজন কমানোর জন্য নিয়মতান্ত্রিকভাবে খেতে হবে। অতিরিক্ত চর্বিযুক্ত ও সম্পৃক্ত চর্বিযুক্ত খাবার কমিয়ে খেতে হবে। নিয়মিত

শরীরচর্চা করতে হবে।

১৪

আইনস্টাইন স্কুল জীবনে গণিতে ফেল করতেন

আইন্সটাইন স্কুল জীবনে কখনোই গণিতে ফেল করেন নি। তিনি গণিতে বরাবরই ভালো ছিলেন এবং সবসময়ই ভালো ফলাফল করেছেন। মাত্র ১২ বছর বয়সে তিনি স্কুলের শিক্ষাক্রমের গন্ডি পেরিয়ে নিজে নিজেই বীজগণিত এবং জ্যামিতি চর্চা করতে শুরু করেন। সেই বয়সেই তিনি জ্যামিতির অনেক তত্ত্ব নিজে নিজেই প্রমাণ করেন। এই সময় পীথাগোরাসের উপপাদ্যের প্রমাণের একটি নতুন কৌশল উদ্ভাবন করেন। ১৫ বছর বয়সের মধ্যে তিনি ক্যলকুলাসের দুটি মূল ধরা ডিফারেন্সিয়াল এবং ইন্টিগ্রাল আয়ত্ব করে ফেলেন। একসময় তিনি গণিতবিদ হিসেবে পরিচিতিও লাভ করেন।

আইনস্টাইনের ফেল হওয়ার মিথ কিভাবে ছড়িয়েছে সেটা এখনো নিশ্চিত হওয়া যায় নি। "রিপ্লি'স বিলিভ ইট অর নট"ও আইনস্টাইনের ফেলের তথ্য দিয়েছিলো। সবচেয়ে গ্রহনযোগ্য মতামত অনুযায়ী, আইনস্টাইনের স্কুল জীবনের শেষ পরীক্ষার সময় স্কুল কর্তৃপক্ষ গ্রেডিংএর পদ্ধতি ঘুরিয়ে দিয়েছিলো। আগে যেখানে ১ থেকে ৬ পর্যন্ত গ্রেড ছিলো এবং ১ দিয়ে সর্বোচ্চ গ্রেড বোঝানো হতো সেখানে উল্টে দিয়ে ৬ কে সর্বোচ্চ গ্রেডে পরিণত করা হয়। তাঁর শেষ পরীক্ষার নম্বরপত্র দেখে কেউ হয়তোবা বিভ্রান্ত হয়েছিলো।

১৫
একস্থানে দুইবার বজ্রপাত হয় না

একস্থানে দুইবার বর্জ্রপাত হয় না বলে একটা কথা প্রচলিত আছে। কিন্তু এর কোনো বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নেই। বর্জ্রপাতের পুর্বে মেঘে মেঘে ঘষা লেগে মেঘ এবং মাটির মধ্যে বিশাল ভোল্টেজের পার্থক্য তৈরি হয়। ফলে একটা বিদ্যুৎপ্রবাহের প্রবণতা তৈরি হয় কিন্তু বাতাস বিদ্যুৎ কুপরিবাহী হওয়ায় বিদ্যুৎ পরিবহন সহজ হয় না। ভোল্টেজ একটা নির্দিষ্ট পরিমানের চেয়ে বেশি হলে বাতাসে ব্রেকডাউন ঘটে যার ফলে বাতাসের পরমানুর শেষ কক্ষপথ থেকে ইলেক্ট্রন সরে গিয়ে পরিবাহিতা তৈরি হয়। এই ব্রেকডাইনের কারনে বিদ্যুৎ পরিবহন শুরু হয় এবং এসময় যদি আশেপাশে কোনো উঁচু, ভেজা বা ধাতব বস্তু থাকে তাহলে বিদ্যুৎ সেই দিক দিয়ে প্রবাহিত হওয়ার চেষ্টা করে। এই কারনে বর্জ্র বিদ্যুৎ সাধারণত উঁচু যায়গা যেমন গাছের মাথা, টাওয়ার প্রভৃতিতে আঘাত হানে বেশী। একই স্থানে দুইবার বর্জ্রপাত না হওয়ার পেছনে কোনো যুক্তি নেই। প্রতিবছর আমেরিকার এ্যাম্পায়ার স্টেট বিল্ডিং

প্রায় শতাধিকবার বর্জ্রাহত হয়। এবং কোনো স্থানে যদি একটি মাত্র উঁচু বস্তু থেকে থাকে বর্জ্রপাত সর্বদাই ওই বস্তুর উপর ঘটার সম্ভবনা বেশী থাকবে।

১৬
হিগস বোসন আবিষ্কারের পিছনে সত্যেন্দ্রনাথ বসুর অবদানকে যথাযথ মূল্যায়ন করা হয় নি

“হিগস বোসন” শব্দটির বোসন অংশটুকু বাঙ্গালি বিজ্ঞানী সত্যেন্দ্রনাথ বসুর নামে নামকরন করা হয়েছে। কিন্তু এই নামকরণের সাথে ‘হিগস’ কণাটির আসলে কোনো সম্পর্কই নেই। বিজ্ঞানী সত্যেন্দ্রনাথ বসু কিছু সাবএটমিক পার্টিকেলের বৈশিষ্ট্যসূচক পরিসংখ্যান তত্ত্বের প্রবক্তা যা পরে বোস-আইনস্টাইন তত্ত্ব হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। পরবর্তীতে কিছু কনিকা আবিষ্কৃত হয় যেগুলো তাঁর প্রণীত তত্ত্ব মেনে চলে। তাঁর প্রতি সম্মান রেখে এই কণিকাগুলোকে বোসন নাম দেওয়া হয়। কিন্তু এই নামকরণের মানে এই নয় যে এখন নতুন কোনো কণিকা আবিষ্কৃত হলে তাতে তাঁর অবদান থাকবে। জোতির্বিদ সুব্রহ্মণ্যন চন্দ্রশেখর নক্ষত্রসমূহের চন্দ্রশেখর সীমার প্রবক্তা। তাঁর প্রতি সম্মান দেখিয়ে নাসার একটি টেলিস্কোপের নাম দেওয়া হয় ‘চন্দ্রশেখর টেলিস্কোপ’। এখন সেই টেলিস্কোপের মাধ্যমে যদি সাড়া

জাগানো কোনো মহাজাগতিক ঘটনা আবিষ্কার করা হয় তাতে চন্দ্র শেখরের নিশ্চয়ই কোনো অবদান থাকবে না। হিগস বোসনের ব্যাপারটিও তেমনই।

১৭
কলম্বাস আমেরিকা আবিষ্কার করেছেন

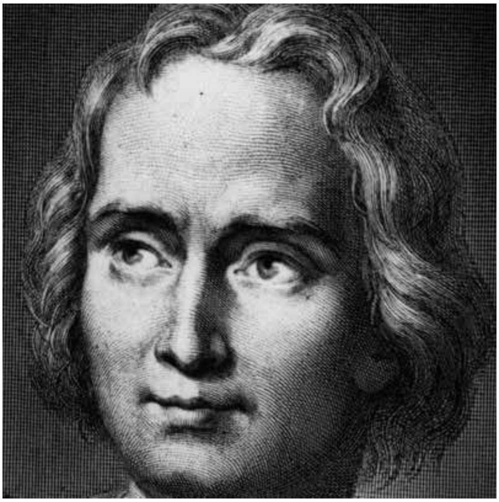

প্রথমত: আমেরিকার সভ্যতার ইতিহাস অত্যন্ত প্রাচীন অর্থাৎ হাজার হাজার বছর ধরে মানুষ আমেরিকায় বসবাস করে আসছে। সেই হিসেবে কলম্বাস এবং তাঁর সঙ্গী-সাথীরাই প্রথম আমেরিকাগামী কথাটার কোনো ভিত্তি থাকে না। তবে আমরা যদি এই প্রেক্ষিত বাদ দিই, অর্থাৎ ইউরোপ থেকে আমেরিকাগামী প্রথম ব্যক্তিকে আমেরিকার আবিষ্কারক হিসেবে স্বীকৃতি দিই তারপরও বলতে হয় কলম্বাস আমেরিকা আবিষ্কার করেন নি। অর্থাৎ কলম্বাস আমেরিকায় গমনকারী প্রথম ইউরোপীয় ব্যক্তি নন। আমেরিকাগামী প্রথম ইউরোপীয় ব্যক্তির নাম লীফ এরিকসন (Leif Ericson)। তিনি কলম্বাসের আমেরিকা অভিযানের প্রায় ৫০০ বছর পূর্বে ১১ শতকে আমেরিকায় গমন করেন। তিনি উত্তর আমেরিকার বর্তমান কানাডার একটি দ্বীপ নিউ

ফাউন্ডল্যান্ডে বসতি স্থাপন করেন।

১৮

গোল্ডফিসের স্মৃতি মাত্র দুই/তিন সেকেন্ড

এটি এতোই প্রচলিত একটি মিথ যে ২০০৩ সালে Gold Fish Memory নামের একটা মুভি মুক্তি পেয়েছে। কিন্তু প্রকৃত ব্যাপার হচ্ছে মাছ হিসেবে গোল্ড ফিশের স্মৃতি যথেষ্টই উন্নত। গবেষনায় দেখা গেছে গোল্ড ফিশ মাসাধিক তো বটেই এমনকি কিছু কিছু জিনিস একবছর পরেও মনে রাখতে পারে। শুধু তাই নয় গোল্ড ফিশকে ট্রেনিং দিয়ে বিশেষ বিশেষ কাজও করানো যায়। এদের বিশেষ বিশেষ রংএর প্রতি বিশেষ বিশেষ প্রতিক্রিয়া প্রশিক্ষণ দেওয়া যায়। এরা আলাদা আলাদা সঙ্গীতও সনাক্ত করতে পারে। যারা একুরিয়ামে গোল্ড ফিশ পোষেন, গোল্ডফিশ তাদের সেই মালিকদের চিনতে পারে এবং যে তাকে প্রতিদিন খাবার দেয় তাকে দেখলেই গোল্ড ফিশকে খাবার গ্রহণের প্রস্তুতি নিতে দেখা যায়। গবেষকরা গোল্ড ফিশের স্মৃতি পরীক্ষার জন্য তাদেরকে বিশেষ বিশেষ লিভার চাপার প্রশিক্ষণ দিয়েছেন। তাঁরা গোল্ড ফিশের একুয়ারিয়ামে কয়েকটি লিভার সেট করেন

এবং এমন ব্যবস্থা করেন যে দিনের একটি বিশেষ সময়ে একটি বিশেষ লিভার চাপ দিলে খাবার বের হবে। দেখা গেলো যে কোন সময়ে কোন লিভার চাপ দিলে খাবার বের হবে গোল্ডফিশ সেটা মনে রাখতে পারে এবং সেই অনুযায়ী লিভার চেপে খাবার সংগ্রহ করতে পারে।

১৯
সাধারণ তাপমাত্রাতেও কাঁচ প্রবাহিত হয়

বলা হয়ে থাকে কাচ super cooled liquid হওয়ার কারনে সাধারণ কক্ষ তাপমাত্রাতেও খুব ধীরে ধীরে প্রবাহিত হয় এবং আমরা যদি জানালার কাচ পর্যবেক্ষণ করি তাহলে দেখতে পাব কয়েক বছরের মধ্যে গ্লাসের স্বাভাবিক প্রবাহের কারনে এবং পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণজনিত কারনে নিচের অংশ মোটা হয়ে গেছে এবং উপরের অংশ অপেক্ষাকৃত চিকন হয়ে গেছে। এটি আসলে একটি ভুল তত্ত্ব। সম্প্রতি গবেষকরা এই তত্ত্বের পরীক্ষা-নীরিক্ষা করে কোনো যুক্তি যুক্ততা পান নি। তাছাড়া যদি এমনটিই হতো তাহলে মিসরীয় সভ্যতা কিংবা প্রাচীন সভ্যতাগুলো হতে প্রাপ্ত কাচের পুরাকীর্তিগুলো গোলগাল হয়ে তলানীতে পড়ে থাকত। শুধু তাই নয় প্রাচীন টেলিস্কোপগুলোর কাচের আকার খুব সামান্য বদলে গিয়ে থাকলেও সেগুলোর দৃশ্যগুলো এখন দোমড়ানো মনে হতো কিন্তু সেই টেলিস্কোপের দৃশ্য এখনো যথেষ্ট সুস্পষ্ট। প্রকৃত পক্ষে কাচের প্রবাহিত হওয়ার জন্য একটা নির্দিষ্ট পরিমানের উপরে তাপমাত্রা তুলতে হয় যাকে বলা হয় glass transition temperature. এই তাপমাত্রা

কক্ষতাপমাত্রার চেয়ে অনেক বেশী এবং এই কারনে কক্ষতাপমাত্রায় কাচ কখনোই প্রবাহিত হয় না। বরং যেসব জানালার কাচ নিচের দিকটা সামান্য মোটা পাওয়া গেছে সেগুলো প্রস্তুতির সময় সুষম ভাবে তৈরি করা যায় নি এবং স্থিতিশীল করার জন্য সেগুলোকে মোটাদিক নিচের দিকে দিয়েই জানালায় লাগানো হয়েছিলো এবং তদুপরি সব প্রাচীন জানালার কাচ আসলে নিচের দিকে মোটাও নয়।

২০

মানুষের উৎপত্তি হয়েছে বানর থেকে

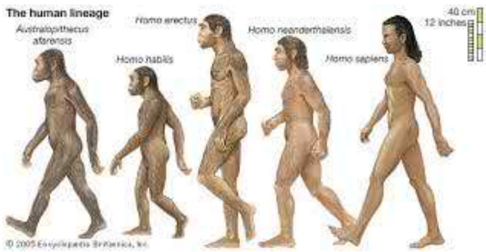

মানুষের উৎপত্তি বানর থেকে হয়নি বরং বলা যেতে পারে বানর এবং মানুষের পূর্বপুরুষ অভিন্ন। মানুষের উৎপত্তি বানর থেকে হয়েছে এই কথা প্রচলিত হয়েছে সৃষ্টিতত্ত্ববাদীদের মাধ্যমে। কিন্তু বিবর্তন বিশেষজ্ঞরা কিংবা ডারউইন নিজেও কখনো বলেন নি মানুষের উৎপত্তি বানর থেকে হয়েছে। বানর এবং মানুষ প্রায় ৯৫% একই জিন বহন করে এবং প্রায় কোটিখানেক বছর আগে এরা একই পূর্বপুরুষ হতে বিচ্ছিন্ন হতে শুরু করে। আধুনিক হোমিনিড গোত্রীয় প্রাণীগুলো প্রায় ৭০ লাখ বছর আগে থেকে বিচ্ছিন্ন হতে থাকে। এই সময়ের মধ্যে মানুষের কাছাকাছি (*Homo* গণভুক্ত) অনেকগুলো প্রজাতির উদ্ভব ঘটে। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য *Homo habilis, Homo erectus,* এবং *Homo neanderthalensis* প্রভৃতি। এদের মধ্যে শেষোক্ত প্রজাতি ছিলো বর্তমান *Homo sapiens* এর খুব কাছাকাছি। তবে একমাত্র মানুষ ছাড়া হোমো গণভুক্ত বাকী সবগুলো প্রজাতির বিলুপ্তি ঘটেছে।

২১

উটপাখি বিপদ দেখলে বালিতে মাথা গুঁজে ফেলে

বিপদে পড়ুক আর যাই ঘটুক উটপাখি কখনোই বালিতে মাথা গোঁজে না। যেকোন বিপদ বা ভয়ে উটপাখির প্রথম প্রতিক্রিয়া হচ্ছে ঝেড়ে দৌড় দেওয়া। এর দুটি উদ্দেশ্য। প্রথমত, দৌড়ে নিরাপদ স্থানে চলে যাওয়া (উটপাখি ঘন্টায় প্রায় ৪০ কিলোমিটার বেগে দৌড়াতে পারে) আর দ্বিতীয়ত, শিকারীর নজর অন্যদিকে ফেরানো, যদি শিকারি ডিমের কাছাকাছি থাকে। তাছাড়া উটপাখি যে বিপদে শুধু পালিয়ে বেড়ায় তা-ও নয় অনেক সময় উটপাখি সম্ভাব্য বিপদের মুখোমুখি হয় এবং আক্রমনাত্মক অবস্থান নেয়। এরা পা-এর লাথি দিয়ে এমনকি সিংহকেও কাবু করে ফেলতে সক্ষম। তবে অধিকাংশ সময় এর খুব শক্ত আঘাত করে না। বালিতে মাথা না গুঁজলেও উটপাখি তাদের ডিম বালিতে গুঁজে রাখে।এই কারনে পুরুষ পাখিটি বালিতে বড়সড় গর্ত করে। এই সময় হয়তে তাদের দেখে মনে হতে পারে তারা বালিতে মাথা গুঁজে আছে। বালিতে মাথা গোঁজার মিথ আরেকটি কারনে তৈরি হতে পারে। সেটি হলো উটপাখির মাথার অংশটি ধুষর ও হালকা রংএর। দুর থেকে দেখে

বালি থেকে আলাদা করা যায় না। ফলে মনে হতে পারে এরা বালিতে মাথা গুঁজে আছে।

২২
জেমস ওয়াট বাষ্পীয় ইঞ্জিন উদ্ভাবন করেন

জেমস ওয়াট বাষ্পীয় ইঞ্জিন উদ্ভাবন করেন নি। জেমস ওয়াট এবং কেতলি সম্পর্কিত যেই কাহিনী আমরা ছোটো বেলায় পড়ে এসেছি সেটিও একটা হোকস্ (Hoax)। কাহিনীটি হল এই রকম: জেমস্ ওয়াট একবার কেতলিতে পানি গরম করছিলেন। হঠাৎ দেখতে পেলেন কেতলির ঢাকনা উপরের দিকে উঠে যাচ্ছে। তিনি লক্ষ করেন পানি বাষ্পীভূত হয়ে ঢাকনার নিচে চাপ দিচ্ছে। অর্থাৎ বাষ্পের কাজ করার সামর্থ আছে। এই ঘটনা থেকে তিনি বাষ্পীয় ইঞ্জিন উদ্ভাবন করেন। কিন্তু প্রকৃত ঘটনা হলো বাষ্পীয় ইঞ্জিন উদ্ভাবন করেছেন থমাস নিউকমেন (Thomas Newcomen)। ১৭১২ সালে তিনি এটি উদ্ভাবন করেন। তাঁর উদ্ভাবিত বাষ্পীয় ইঞ্জিনকে atmospheric engine নাম দেওয়া হয়। অপর দিকে জেমস ওয়াটের জন্মই হয়েছে

নিউকমেনের উদ্ভাবনের দুই যুগ পরে ১৭৩৬ সালে। তিনি নিউকমেনের উদ্ভাবিত ইঞ্জিনের উন্নতি সাধন করেন যেটি পরে ওয়াট স্টীম ইঞ্জিন নামে প্রচলিত হয়। তিনি নিউকমেনের ইঞ্জিনকে কলকারখানায় ব্যবহারোপযোগী করেন।

২৩
ঠান্ডা লাগলে ভিটামিন সি নিরাময় করতে পারে

সাধারণ ঠান্ডা লেগে থাকে বিশেষ কিছু ভাইরাসের আক্রমনে। এগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে rhinoviruses, coronaviruses এবং respiratory syncytial virus প্রভৃতি। যদিও ভিটামিন সি মানুষের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য বেশ কার্যকর ভূমিকা রাখে কিন্তু ঠান্ডা লাগলে ভিটামিন সি তার উপশম করতে পারে না। ১৯৭০ সালে Linus Pauling দাবী করেন ভিটামিন সি ঠান্ডা লাগার প্রভাব উল্লেখযোগ্য পরিমানে হ্রাস করে। তাঁর দাবীর মাধ্যমে অনুপ্রাণীত হয়ে গবেষকরা পরবর্তীতে প্রচুর পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেন এবং দেখেন যে ঠান্ডা নিরাময়ে মোটের উপর ভিটামিন সি এর কোনো প্রভাব নেই। প্রায় ১০০০০ অংশগ্রহীর উপর ৩০ টির ও বেশী পরীক্ষা করা হয় যাদের প্রতিদিন ২ গ্রাম করে ভিটামিন সি সেবন করতে দেওয়া হয়। ঠান্ডার

উপর ভিটামিন সি এর প্রভাব যদিও পাওয়া যায় নি তবে এই গবেষণা হতে দেখা যায়, যারা খেলাধুলা করেন এবং নিয়মিত শরীরচর্চা বা শারিরীক কসরত করেন তাঁরা ভিটামিন সি সেবনে উদ্যম বৃদ্ধি করতে পারেন এবং মানসিক চাপ দূর করতে পারেন।

২৪
মানুষের পাঁচ ধরনের ইন্দ্রিয় বা অনুভূতি আছে

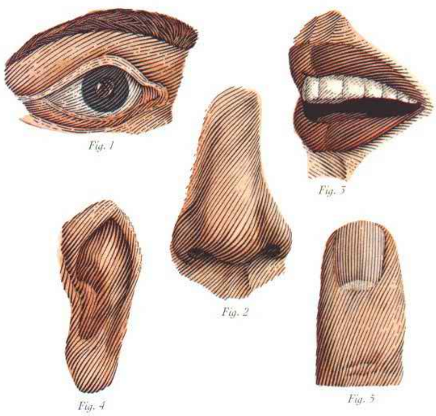

আমরা ছোট বেলা থেকে জেনে এসেছি মানুষের পাঁচ ধরনের ইন্দ্রিয় আছে। এগুলো হচ্ছে দৃশ্যানুভূতি, স্পর্শানুভূতি, গন্ধের অনুভূতি, স্বাদের অনুভূতি এবং শ্রবণ অনুভূতি। কিন্তু এটি একটি মহাভুল তথ্য। আমরা একটু সচেতনতার সাথে খেয়াল করলে উপলব্ধি করতে পারব আরো অনেক ধরনের অনুভূতিই আমাদের আছে! যেমন: ভারসাম্যের অনুভূতি- আমাদের শরীরের ভারসাম্য এই অনুভূতির মাধ্যমে বোঝা যায়। এই ইন্দ্রিয়ের অবস্থান কানের ভিতর। ত্বরণের অনুভূতি: আমরা যদি একটি নির্দিষ্ট বেগে চলতে থাকি তাহলে আশেপাশে না তাকালে বুঝতে পারব না, কিন্তু যদি বেগের পরিবর্তন হয় তাহলে তা অনুভব করতে পারি। ব্যাথার অনুভূতি- ব্যাখ্যা নিষ্প্রয়োজন! এটি যে স্পর্শানুভূতি নয় সেটিও বলা নিষ্প্রয়োজন। তাপমাত্রার অনুভূতি, ক্ষুধা,

তৃষ্ণা, রক্তের কার্বন-ডাইঅক্সাইডের পরিমানের অনুভূতি (আপনি এই অনুভূতি না পেলে আমাকে দুষবেন না! তবে দম বন্ধ রেখে কিংবা মুখে একটা পলিব্যাগ ধরে নিঃশ্বাস নিতে নিতে উপলব্ধি করতে পারবেন), সময়ের অনুভূতি- কি পরিমান সময় অতিক্রান্ত হচ্ছে সেটা বোঝার ক্ষমতাও আমাদের আছে, কিন্তু ঘড়ির কল্যাণে এই অনুভূতি ভোঁতা হয়ে গেছে। এর বাইরেও আরো কিছু অনুভূতি আছে।

২৫

বিবর্তন তত্ত্ব প্রাণের উদ্ভব ব্যাখ্যা করে

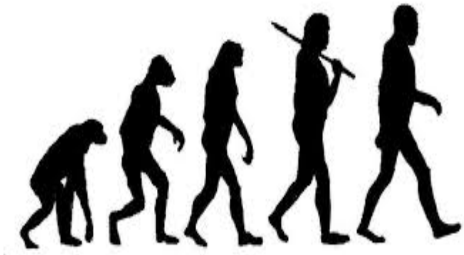

বিবর্তন তত্ত্ব আসলে প্রাণের উদ্ভব ব্যাখ্যা করে না। প্রাণের উদ্ভব নিয়ে গবেষণার জন্য জীব বিজ্ঞানের একটি আলাদা শাখা আছে, সেটি হচ্ছে abiogenesis বা উদ্ভব বিজ্ঞান। উদ্ভব বিজ্ঞানীরা প্রাণের উৎপত্তি সংক্রান্ত কোনো গ্রহণযোগ্য তত্ত্ব প্রতিষ্ঠা করতে না পারলেও বিবর্তন তত্ত্বের তাতে কিছু যায় আসে না। বিবর্তন শুধুমাত্র আলোচনা করবে একপ্রজাতি থেকে অন্যপ্রজাতির রূপান্তর, জীনগত পরিবর্তন তথা মিউটেশন। আনবিক বিবর্তনও বিবর্তনেরই একটি আলোচ্য বিষয়। আনবিক পর্যায়ে প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে যে পার্থক্য তৈরি হয় এবং তার ফলে জীবের বৈশেষ্ট্যে যে পরিবর্তন ঘটে সেটা এই ক্ষেত্রে আলোচনা করা হয়। জীবাশ্ম আলামত থেকে বিভিন্ন প্রজাতির মধ্যে সম্বন্ধীকরণ, প্রাকৃতিক নির্বাচন এসবও বিবর্তনের আলোচনার বিষয়। অর্থাৎ বিবর্তনের আলোচনার বিষয় হচ্ছে প্রাণের বিকাশ কিভাবে ঘটে, এবং বিবর্তন এটা ধরে নিয়েই এগোয় যে প্রাণের যেভাবেই হোক ইতিমধ্যে উৎপত্তি হয়েছে।

২৬

চাঁদে মানুষ যাওয়া নিয়ে নির্মিত ষড়যন্ত্রতত্ত্বগুলোর জবাবে

মানুষ ফ্যান্টাসী পছন্দ করে। বস্তবতার কাটখোট্টা জগৎ তাকে যথাযথভাবে বিনোদিত বা আকৃষ্ট করে না। ফলে একশ্রেনীর মানুষ বিভিন্ন ধরনের ঘটনা, তত্ত্ব এসবের বিকল্প ব্যাখ্যা দাঁড় করানোর চেষ্টা করে বা এধরনের কর্মকান্ডে সমর্থন ও আস্থা স্থাপন করে আনন্দ লাভ করে। এভাবেই বিভিন্ন বিষয় নিয়ে ষড়যন্ত্র তত্ত্ব প্রচলিত হয়। এগুলোর প্রতিষ্ঠার পেছনে সামাজিক বা রাজনৈতিক কারণও জড়িত থাকে। গত শতাব্দীর সবচেয়ে বহুল প্রচলিত ষড়যন্ত্রতত্ত্বগুলো নির্মিত হয়েছে চাঁদে মানুষ অবতরণ নিয়ে। একশ্রেনীর মানুষের কাছে মানুষ্যবাহী চন্দ্রাভিযান পুরোপুরি ধাপ্পাবাজি হিসেবে পরিগণিত এবং এটি যে শুধু তাঁরা বিশ্বাস করেন তাই নয় এর স্বপক্ষে প্রচুর যুক্তি-প্রমাণ হাজির করেন। তবে বলাই বাহুল্য সেসব যুক্তি-প্রমাণে প্রচুর ফাঁক-ফোঁকর থেকে যায় আর সেকারণেই সেগুলো ষড়যন্ত্র তত্ত্ব হিসেবে পরিচিত। অথচ চাঁদে মানুষ পাঠানোর জন্য নাসা বিপুল সময় ধরে প্রস্তুতি গ্রহণ করেছে, বিপুল পরিমান মানুষ এই অভিযানগুলো সফল করার জন্য কাজ করেছে। মানুষ চাঁদে যায়নি এর স্বপক্ষে এত বেশী যুক্তি-প্রমান হাজির করা হয়েছে যে সেসব বিস্তারিত লিখতে গেলে একটি বই হয়ে যাবে (এবং তেমন একটি বই লিখতেও যাচ্ছি!)। তাই এখানে শুধুমাত্র উল্লেখযোগ্য কয়েকটি যেগুলো বহুল প্রচলিত এবং সাধারণ মানুষের একটি অংশেরও যেসব বিষয়ে কৌতুহল আছে সেগুলো ব্যাখ্যাপূর্বক খন্ডন করা হলো। যাঁরা এই বিষয়ে আরো বিস্তারিত জানতে চান তাঁরা এই উইকিপিডিয়া আর্টিকেলটি পড়তে পারেন।

ষড়যন্ত্র-১: চাঁদের মাটিতে মানুষ পা রাখেনি এই ষড়যন্ত্রতত্ত্বে যাঁরা বিশ্বাস করেন তাঁরা তাঁদের বিশ্বাসের পক্ষে যুক্তি হিসেবে চন্দ্রাভিযানের এইধরনের ছবিগুলো হাজির করেন। ছবিতে কালো আকাশে কোনো তারা দেখা যাচ্ছে না (প্রথম ছবি)। তাঁদের ভাষ্য হলো যেহেতু চাঁদে বায়ুমন্ডল নেই তাই সূর্যালোক চাঁদের বায়ুমন্ডলে বিক্ষিপ্ত হয়ে তারাগুলোকে অদৃশ্য করতে পারবে না। সেই ক্ষেত্রে ব্যাকগ্রাউন্ডে ঝকঝকে তারার অবস্থান থাকার কথা।

কিন্তু দ্বিতীয় ছবিটি দেখুন, এটি আন্তর্জাতিক মহাকাশ স্টেশন (ISS) থেকে তোলা পৃথিবী পৃষ্ঠের ছবি যেটি পৃথিবীকেই আবর্তন করে ঘুরছে। একই যুক্তি অনুসারে এখানে ব্যাকগ্রাউন্ডে তারার উপস্থিতি থাকার কথা কিন্তু তা নেই। এই দ্বিতীয় ছবিটি নিয়েও যদি কারো সন্দেহ থাকে তাহলে এই লিংক থেকে ISS এর লাইভ ভিডিও সম্প্রচার দেখতে পাবেন, সেখানেও কোনো তারা নেই।

আন্তর্জাতিক মহাকাশ স্টেশন থেকে তোলা পৃথিবীপৃষ্ঠের ছবি, পেছনে কালো পটভুমি।

ব্যাকগ্রাউন্ডে তারা না দেখা যাওয়ার কারণ হচ্ছে এক্সপোজার। ছবি তোলার সময় লেন্সের এক্সপোজার কমিয়ে বা বাড়িয়ে আলোর পরিমান নিয়ন্ত্রিত করা হয় (মূলতঃ শাটার স্পীডের মাধ্যমে তা করা হয়)। যদি এক্সপোজার বেশী হয় তাহলে অনেক ক্ষীণ আলোর উৎসও ছবিতে ধরা পড়বে। দিনের বেলায় চাঁদ এবং পৃথিবী পৃষ্ঠের তুলনায় তারাগুলোর উজ্জ্বলতা অতি অতি অতি ক্ষীণ। এই ছবিগুলোতে যদি এক্সপোজার বাড়ানো হতো তাহলে তারা হয়তো দৃশ্যমান হতো কিন্তু সেই ক্ষেত্রে চাঁদ ও পৃথিবী পৃষ্ঠ অতিরিক্ত এক্সপোজারের কারণে সাদা হয়ে যেত এবং এগুলোর পৃষ্ঠের অনেক বৈশিষ্ট্য ছবিতে আর পাওয়া যেত না। আর এই ছবিগুলোর সাবজেক্ট হচ্ছে যথাক্রমে চাঁদ ও পৃথিবীর পৃষ্ঠ, পটভুমির কালো আকাশ নয় তাই ক্যামেরার এক্সপোজার এমনভাবে রাখা হয়েছে যাতে এদের পৃষ্ঠের বৈশিষ্ট্যগুলো ছবিতে স্পষ্ট থাকে। নিচের ছবিতে দেখানো হলো কীভাবে এক্সপোজার পরিবর্তনের মাধ্যমে অপেক্ষাকৃত ক্ষীণ আলোর উৎসগুলোর ছবিও তোলা যায় এবং সেই ক্ষেত্রে উজ্জ্বল আলোর উৎসগুলো অতিরিক্ত এক্সপোজড হয়ে সাদা হয়ে যায়।

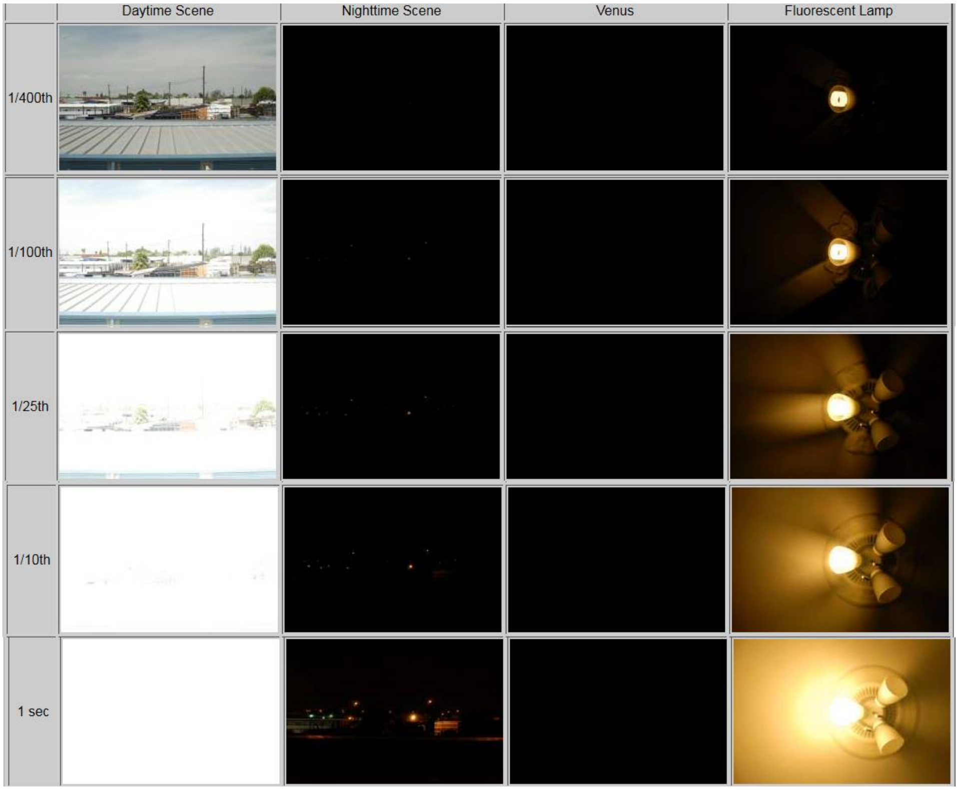

ষড়যন্ত্র-২: অনেকে মনে করেন যদিও চাঁদের মাটিতে বাতাস নেই কিন্তু চাঁদে যে পতাকা স্থাপন করা হয়েছে তার ছবিতে দেখা যায় পতাকা উড়ছে। এখান থেকে তাঁরা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন এটি আসলে অ্যারিজোনার মরুভূমিতে নির্মিত হয়েছে!

ব্যাখ্যা: একটু ভালো করে নিচের ছবিদুটো লক্ষ্য করুন, পতাকা কি সত্যিই উড়ছে?

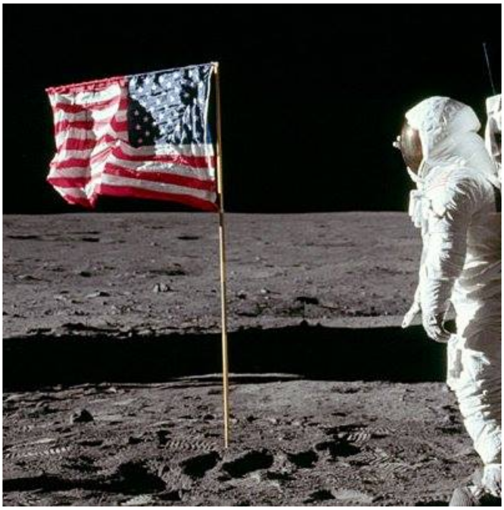

বাজ অলড্রিন পতাকাকে স্যালুট করছেন।

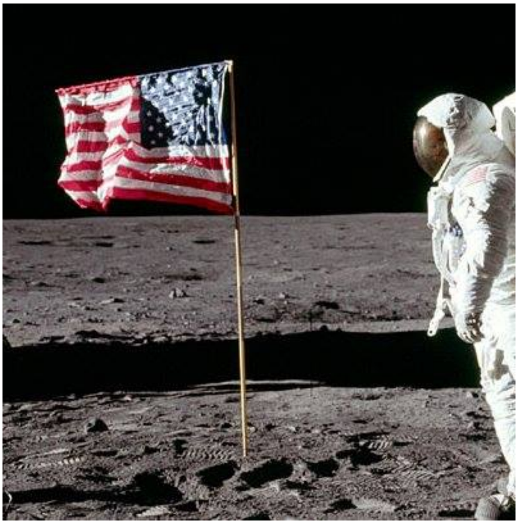

স্যালুট শেষে হাত নামিয়ে আনার পরেও পতাকার অবস্থান একই আছে।

পতকার একপাশ যেমন ফ্রেমের সাথে যুক্ত উপরের অংশও কিন্তু একটি টিউবুলার অ্যালুমিনিয়ামের ফ্রেমের মাধ্যমে যুক্ত। সেটি এই ছবি থেকে স্পষ্ট না বোঝার কোনো কারণ নেই। আর নিচের অংশ কুঁকড়ে আছে দেখে দূর

থেকে মনে হতে পারে পতাকা উড়ছে, সেটি একটি দৃষ্টিভ্রম তৈরির জন্য আরোপ করা হয়েছে যেন পতাকাটি উড়ছে বলে মনে হয়। আর দুটি ছবির পার্থক্যগুলো দেখুন। বাজ অলড্রিন প্রথম ছবিতে পতাকাকে স্যালুট করছেন। সেই স্যালুটকৃত অবস্থায় তার ডান হাত মাথায় ঠেকানো, ভালো করে লক্ষ্য করলে ডান হাতের দুটি আঙ্গুল দেখতে পাবেন হেলমেটের উপরে। দ্বিতীয় ছবিতে হাত নিচে নেমে এসেছে কিন্তু দুটি ছবিতেই পতাকার উড়ন্ত অবস্থা হুবহু একই আছে। যদি পতাকা বাতাসেই উড়ত তাহলে কি কয়েক সেকেন্ডের ব্যবধান হুবহু একই রকমের কোঁকড়ানো অবস্থায় থাকত?

ষড়যন্ত্র-৩: "ঈগল মুন-ল্যান্ডার এবং পাথরের উৎপন্ন ছায়ার দিক ভিন্ন। চাঁদে কি দুইটা সূর্য আলো দেয়?"

ব্যাখ্যা: একই উৎসের ভিন্ন ভিন্ন বস্তুর ছায়ার দিক নির্ভর করবে অনেকগুলো বিষয়ের উপর এবং এসবের উপর নির্ভর করে ছায়ার দিক কিছুটা ভিন্ন ভিন্ন দেখাতে পারে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে দর্শক (এই ক্ষেত্রে ক্যামেরা), ছায়া ধারনকারী পৃষ্ঠের ঢাল, ক্যামেরার লেন্সের প্রশস্ততা ইত্যাদি।

চাঁদের মাটিতে তোলা ছবি, ঈগল চন্দ্রযান এবং চন্দ্রপৃষ্ঠের কিছু বস্তুর ছায়া দেখে আলোক উৎস ভিন্ন মনে হচ্ছে।

ওয়ার্কশপে চাঁদে তোলা ছবির মতো করে মডেল তৈরি করে ছায়া পরীক্ষা করা হচ্ছে।

প্রথম ছবিটি চাঁদের পৃষ্ঠে তোলা। যে ছবিটি দেখে ষড়যন্ত্রকারীরা আলোর উৎস নিয়ে প্রশ্ন করেন। এই ছবির বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের আদলে দ্বিতীয় ছবির সেট তৈরি করা হয়েছে ওয়ার্কশপে। চাঁদের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের আদলে তৈরি

বস্তুর পাশাপাশি এতে একটি মার্কারও রাখা হয়েছে বোঝার জন্য। এই মার্কার এবং খেলনা মুনল্যান্ডারের ছায়া থেকে এটি স্পষ্ট যে এই দুটির ছায়া তৈরি হচ্ছে একই উৎস থেকে। কিন্তু মাঝের বস্তুগুলোর ছায়ার কোণ থেকে মনে হচ্ছে এদের আলোর উৎস ভিন্ন। কিন্তু এই বস্তুগুলো যে বন্ধুর পৃষ্ঠের উপরে অবস্থিত তাতে ছায়া যেভাবে পড়ার কথা সেভাবেই পড়েছে। চন্দ্রপৃষ্ঠের জন্যও বিষয়টি একই ভাবে সত্য। যদি মাঝের বস্তুগুলোর ছায়া অন্যান্য বস্তুর একই সমতলে থাকত তাহলে তাদের ছায়াও মোটামুটি একই দিকে উৎপন্ন হত। এই ছবি থেকে আরেকটি ষড়যন্ত্র করা হয় সেটি হচ্ছে নভোচারী যেহেতু ছায়ার মধ্যে আছে সেহেতু তাকে অন্ধাকাচ্ছন্ন দেখানোর কথা। কিন্তু দ্বিতীয় ছবি থেকে এই ষড়যন্ত্রটিও খন্ডিত হয়ে যায়। আলোর উৎস থেকে চন্দ্র পৃষ্ঠে যে পরিমান প্রতিফলন ঘটবে তা নভোচারীর সাদা পোশাকে যথেষ্ট উজ্জ্বলতা তৈরি করবে। বিষয়টি যদি এখনো কারো কাছে অস্পষ্ট থাকে তাহলে সে মিথবাস্টারের ভিডিওটি দেখে নিতে পারে যেখানে পরীক্ষার মাধ্যমে এই ষড়যন্ত্র তত্ত্বটির অসাড়তা প্রমাণ করা হয়েছে।

ষড়যন্ত্র-৪: “চাঁদে মানুষ যদি প্রায় সাড়ে তিনযুগ আগে গিয়ে থাকে তাহলে এখন যেতে পারছে না কেন? এ থেকেইতো বোঝা যায় চাঁদে কখনোই মানুষ যায় নি।”

ব্যাখ্যা: এটি একটি অত্যন্ত খোঁড়া প্রশ্ন। এই প্রশ্ন অনুযায়ী বলা যায় ছোট বেলায় আমি যদি একবার কক্সবাজার বেড়াতে গিয়ে থাকি এবং বড় হয়ে যদি আর না যাওয়া হয় তা থেকে প্রমাণ হয় আমি কখনো কক্সবাজারই যাই নি!

চাঁদে অভিযান বেশ খরচ সাপেক্ষ। চন্দ্রাভিযান উপলক্ষে কাজ করার জন্য

নাসা চার লাখ মানুষ নিয়োগ দিয়েছিলো। চাঁদে মানুষ ছয়বার অভিযান করেছে এবং সেটি যেই প্রোজেক্টের আওতায় করা হয়েছিলো তা এখন আর বিদ্যমান নেই। এমনকি অ্যাপোলো প্রজেক্টের আওতায় আরো তিনটি অভিযান (অ্যাপোলো-১৮-২০) চালানোর কথা ছিলো কিন্তু বড় ধরনের প্রয়োজন ছিলনা বিধায় সেগুলো বাতিল করে দিয়ে সেই ফান্ড এবং সেই কাজে বরাদ্ধ বাহন অন্য কাজে ব্যবহার করা হয়। মানুষ্যবাহী ছয়টি অভিযানে চাঁদে যেসব গবেষণা করার প্রয়োজন ছিলো যা করার জন্য মানুষ প্রয়োজন সেগুলো করা হয়েছে এবং চাঁদের শিলার যথেষ্ট পরিমান নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে। এখন নতুন করে চাঁদে যেতে হলে পুরো প্রক্রিয়াটি আবার প্রথম থেকে শুরু করতে হবে, সরকারকে রাজি করাতে হবে ফান্ডিংএর জন্য আর সত্যি বলতে এখন চাঁদে মানুষ পাঠানো খুব গুরুত্বপূর্ণ নয়। প্রথম যখন চাঁদে যাওয়ার উদ্যোগ নেওয়া হয় তখন রাশিয়ার সাথে মহাশূন্য নিয়ে প্রতিযোগীতা ছিলো, সরকারও তাই দু'হাতে টাকা দিতে কার্পন্য করেনি, এখন এমন কিছুও নেই। যারা মনে করেন বিগত সাড়ে তিনযুগে প্রযুক্তিগতভাবে মানুষ অনেক অগ্রসর হয়েছে এখন মানুষ্যবাহী চন্দ্রাভিযান আরো সহজ হওয়ার কথা, তাই এখন চাঁদে মানুষ না পাঠানোর কোনো যুক্তি নেই। কিন্তু প্রযুক্তিগত অগ্রসরতার ফলাফল হওয়ার কথা আসলে সম্পূর্ণ বিপরীত। প্রযুক্তিগত উৎকর্ষ বরং মানুষের প্রয়োজনীয়তা হ্রাস করে। একসময় যে কাজের জন্য মানুষ পাঠানোর প্রয়োজন হতো এখন সে কাজের জন্য মানুষ না হলেও চলে। মানুষ যতই প্রযুক্তিগত সক্ষমতা লাভ করছে ততোই সে ঝুঁকিপূর্ণ কাজগুলোকে মানুষের বদলে রোবটের মাধ্যমে করার চিন্তাভাবনা করছে। দুর্গত এলাকায় কীভাবে রোবটের মাধ্যমে উদ্ধার তৎপরতা চালানো যায় তা নিয়ে ভাবছে। ধারনা করা হয় ভবিষ্যতে মানুষ সরাসরি যুদ্ধ করবে না, বরং যুদ্ধের জন্য রোবট পাঠাবে।

কাজেই বর্তমান সময়ে চাঁদে মানুষ পাঠানো হবে সময়, অর্থ, শক্তি এবং

সক্ষমতার অপচয়। যেই সক্ষমতা মানুষ ইতিমধ্যে প্রমাণ করেছে সেটি কিছু ষড়যন্ত্রকারীর কাছে নতুন করে প্রমাণ করার খুব বেশী প্রয়োজন নেই বরং যা প্রয়োজন তা হচ্ছে এই সক্ষমতা বৃদ্ধি করে আরো দুর্লভ কিছু অর্জনের চেষ্টা করা। মহাকাশ গবেষনা এজেন্সীগুলো সেই কাজই করে যাচ্ছে। তারা আগামী কয়েকবছরের মধ্যে মঙ্গলে মানুষ পাঠানোর চিন্তা-ভাবনা করছে এবং এই লক্ষ্যে যে ধরনের গবেষণাগুলো করা প্রয়োজন সেগুলোই করছে।

তথ্যসূত্র

১: মানুষ মস্তিষ্কের ৫ থেকে : চয়ে কিছুটা বেশি করে

http://www.scientificamerican.com/article.cfm?id=people-only-use-10-percent-of-brain

http://en.wikipedia.org/wiki/Ten_percent_of_brain_myth

২. বিশেষ উপযোগী পোশাক ছাড়া মহাশুন্যে গেলে মানুষ ফুলে ফেটে যায়

Mcgraw/Hill Encyclopedia of Astronomy

৩. বিবর্তনের মাধ্যমে জীবের উন্নতি ঘটে

http://listverse.com/2008/02/19/top-15-misconceptions-about-evolution/

৪. স্নায়ুকোষের (neuron) পুনরুৎপাদন হয় না, যদি কোনো স্নায়ুকোষ ধ্বংস হয় তাহলে তার আর প্রতিস্থাপন হবে না

http://www.sciencedaily.com/releases/2006/08/060814133621.htm

http://www.sciencedaily.com/releases/2006/12/061223092924.htm

৫. বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে মস্তিষ্কের কর্মক্ষমতা হ্রাস পায়

http://www.medicalnewstoday.com/releases/176740.php

http://www.telegraph.co.uk/science/science-news/3526983/Older-people-prefer-peace-and-quiet-because-they-cannot-filter-out-distractions.html

৬. উল্কাপিন্ড পতনের সময় বায়ুমন্ডলের সাথে সংঘর্ষে উত্তপ্ত হয়ে যায়

http://en.wikipedia.org/wiki/Meteoroid

http://www.meteorites.com.au/odds&ends/myths.html

৭. মহাশূন্যে অভিকর্ষ অনুভুত হয় না

http://amazing-space.stsci.edu/resources/myths/

http://www.thecollapsedwavefunction.com/2013/03/science-myths-and-misconceptions-part.html

৮. মাথায় আপেল পড়ার ঘটনা থেকে নিউটন মহাকর্ষ সূত্র আবিষ্কার করেন

http://thesoftanonymous.com/2013/06/06/newtons-apple-fact-or-fiction/

৯. চীনের প্রাচীর একমাত্র মানবসৃষ্ট বস্তু যেটা চাঁদ থেকেও দেখা যায়

http://www.scientificamerican.com/article.cfm?id=is-chinas-great-wall-visible-from-space

১০. বাদুড়ের চোখ আছে কিন্তু চোখে দেখে না

http://en.wikipedia.org/wiki/Bat

১১. মার্কনি রেডিও উদ্ভাবন করেছেন / জগদীশ বসু রেডিও উদ্ভাবন করেছেন

https://en.wikipedia.org/wiki/Guglielmo_Marconi

১২. জিহ্বার একেক অংশ একেক ধরনের স্বাদের অনুভূতি তৈরি করে

https://en.wikipedia.org/wiki/Tongue_map

http://www.nytimes.com/2008/11/11/health/11real.html?_r=1

১৩. না খেয়ে থাকলে আমাদের ওজন কমে

http://www.netdoctor.co.uk/womenshealth/features/dietmyths.htm

১৪. আইনস্টাইন স্কুল জীবনে গণিতে ফেল করতেন

http://www.todayifoundout.com/index.php/2011/12/albert-einstein-did-not-fail-at-mathematics-in-school/

http://physics.about.com/b/2007/09/19/physics-myth-month-einstein-failed-mathematics.htm

১৫. একস্থানে দুইবার বজ্রপাত হয় না

http://stormhighway.com/lightning_never_strikes_the_same_place_twice_

myth.php

http://www.accuweather.com/en/weather-blogs/weathermatrix/myth-lightning-never-strikes-twice/19890

১৬. হিগস বোসন আবিষ্কারের পিছনে সত্যেন্দ্রনাথ বসুর অবদানকে যথাযথ মূল্যায়ন করা হয় নি

মুক্তমনা: সার্ণ থেকে হিগস্ বোসন

১৭. কলম্বাস আমেরিকা আবিষ্কার করেছেন

উইকিপিডিয়া: Leif Ericson

উইকিপিডিয়া: Christopher Columbus

১৮. গোল্ডফিসের স্মৃতি মাত্র দুই/তিন সেকেন্ড

Todayifoundout

ডেইলি মেইল

১৯. সাধারণ তাপমাত্রাতেও কাচ প্রবাহিত হয়

Glassnotes

www.cmog.org

২০. মানুষের উৎপত্তি হয়েছে বানর থেকে

The_Myth_Of_Evolution

skeptic.com: top-10-evolution-myths

২১. উটপাখি বিপদ দেখলে বালিতে মাথা গুঁজে ফেলে

ostrich.org

উইকিপিডিয়া: Ostrich

২২. জেমস ওয়াট বাষ্পীয় ইঞ্জিন উদ্ভাবন করেন

উইকিপিডিয়া: Newcomen Steam Engine

উইকিপিডিয়া: Thomas Newcomen

উইকিপিডিয়া: James Watt

২৩. ঠান্ডা লাগলে ভিটামিন সি নিরাময় করতে পারে

উইকিপিডিয়া: Vitamin C and common cold

২৪. মানুষের পাঁচ ধরনের ইন্দ্রিয় বা অনুভূতি আছে

The brain geek

২৫. বিবর্তন তত্ত্ব প্রাণের উদ্ভব ব্যাখ্যা করে

about.com

Studytoanswer.net

ইমতিয়াজ আহমেদ কোরিয়ার কিয়াংপুক ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটিতে পোস্টডক্টরাল গবেষক। তিনি বিজ্ঞান ব্লগ.এবং বিজ্ঞান পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক।

মুক্তবই

একটি বিজ্ঞান ব্লগ উদ্যোগ

https://bigganblog.org